খয়রাতি না অধিকার

রীতিকা খেরা

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মুখবন্ধ/কুমার রাণা ৭

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক সুরক্ষা: দৃষ্টিভঙ্গি ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতৃত্বকালীন সুবিধা ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্গনওয়াড়ি: শিশুর ভবিষ্যতের ভিত্তি ৬৯

চতুর্থ অধ্যায়

মিড-ডে মিল প্রকল্প: শিক্ষা ও পুষ্টি ছাড়িয়ে ৮৯

পঞ্চম অধ্যায়

রেশনব্যবস্থা: খাদ্য নিরাপত্তা থেকে পুষ্টির নিরাপত্তা ১১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

একশো দিনের কাজ: ধারণা ও বাস্তবায়ন ১৩৬

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন: অসহায়দের ভরসা ১৫৭

অষ্টম অধ্যায়

জনতা ভোজনালয় ১৭৮

নবম অধ্যায়

কোভিড: স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ওপরে আঘাত ২০৩

দশম অধ্যায়
সামাজিক নীতিতে উঠে আসা বিভিন্ন প্রশ্ন ২৩৫
একাদশ অধ্যায়
পরিবর্তন কি সম্ভব? ২৫৭
তথ্য ও ব্যবহৃত রচনা সূত্র ২৭৭
পরিশিষ্ট: পরিসংখ্যানগত সারণি ৩০৫

মুখবন্ধ

কোনো সভ্য সমাজকে বিচার করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড কী? তার মোট উৎপাদন (জিডিপি), তার অট্টালিকার উচ্চতা, তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, নাকি তার সামরিক শক্তি? আধুনিক অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক দর্শনের দীর্ঘ ঐতিহ্য এই প্রশ্নের এক ভিন্ন উত্তর দেয়। কোনো সমাজের প্রকৃত মান নির্ধারিত হয় সে তার সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে প্রান্তিক এবং সবচেয়ে অসহায় মানুষদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে, তার দ্বারা। যে রাষ্ট্র ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারে না, শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষাকে সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে না, কিংবা বার্ধক্যে পৌঁছানো মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, সে রাষ্ট্র আর্থনীতিকভাবে যতই সমৃদ্ধ হোক, তার সভ্যতার দাবি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে আম্বেদকর জোর দিয়েছিলেন মেয়েদের উন্নতির ওপর: কোনো সমাজে মেয়েরাই যদি পিছিয়ে থাকে, অবদমিত থাকে, তাহলে সে-সমাজ অগ্রসর সমাজ বলে দাবি করতে পারে না।

এই উপলব্ধি কেবল আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা থেকে আসেনি; ভারতীয় বুদ্ধিচর্চার ঐতিহ্যেও এর ভিত্তি রয়েছে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলা হয়েছে: 'ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ভোগ করো; কারও ধনের প্রতি লোভ কোরো না, কারণ ধন প্রকৃতপক্ষে কারও একার নয়।'

ভারতীয় দর্শনের অন্য ধারাতেও একই ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মহাভারত বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে রাজার প্রথম কর্তব্য রাজস্ব সংগ্রহ নয়, প্রজার রক্ষা। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* রাষ্ট্রকে কেবল কর আদায়ের যন্ত্র হিসেবে নয়, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগব্যাধি এবং আর্থিক বিপর্যয়ের সময় মানুষের

পাশে দাঁড়ানোর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করেছে। বৌদ্ধদর্শন করুণা ও সামাজিক দায়িত্বকে নৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তার সূক্ষ্মতম চিন্তার ধারা কখনো সমাজকে এমন একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করেনি, যেখানে দুর্বল মানুষের পরাজয়কে তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বলে মেনে নেওয়া হবে।

তবু ইতিহাসের আরেকটি ধারাও সমান্তরালে বিকশিত হয়েছে। সেখানে দারিদ্র্যকে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, ভাগ্য অথবা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা নিছক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না; এটি ছিল সামাজিক ক্ষমতার একটি কার্যকর হাতিয়ার। কারণ, যদি মানুষ বিশ্বাস করে যে, তার দারিদ্র্য তার নিজেরই কর্মফল, তবে সে সমাজের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করবে না। অন্যদিকে, যারা সম্পদের অধিকারী, তারাও নিজেদের সুবিধাকে নৈতিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

এই কারণেই আধুনিক গণতন্ত্রের আবির্ভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল। গণতন্ত্র প্রথমবারের মতো ঘোষণা করল, মানুষের মর্যাদা জন্ম, জাত, ধর্ম, লিঙ্গ কিংবা সম্পদের উপর নির্ভর করে না; তা নির্ভর করে তার মানুষ হওয়ার উপর। এই ঘোষণার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক রূপগুলির একটি হল ভারতীয় সংবিধান।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা শুরু হয়, "আমরা, ভারতের জনগণ" এই শব্দগুলি দিয়ে। এই কয়েকটি শব্দের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক মৌলিক রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি। রাষ্ট্র কোনো রাজা, কোনো উপনিবেশিক শক্তি বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়; রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ। ফলে রাষ্ট্রের সম্পদও শেষ পর্যন্ত জনগণেরই সম্পদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে খয়রাত হিসেবে ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। রাষ্ট্র যখন বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করে, তখন সে কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না; সে জনগণের সম্পদ জনগণেরই একটি অংশের কল্যাণে ব্যবহার করছে। রাষ্ট্র যখন একজন বৃদ্ধাকে পেনশন দেয়, তখন সে দয়া করছে না; সে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। রাষ্ট্র যখন একজন গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির জন্য সহায়তা দেয়, তখন সে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করছে না; সে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করছে।

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক সুরক্ষা: দৃষ্টিভঙ্গি

২০০২ সালে পিএইচডি গবেষণার জন্য রাজস্থানের আটটি গ্রামের চারশোটি পরিবারের মধ্যে একটি সমীক্ষা করি। বিষয় ছিল খরা ত্রাণ কার্যক্রম ও জনবিতরণ প্রণালী। সমীক্ষার সময় মে মাস। বাড়মেরের মরুভূমির একটি গ্রামে খরা ত্রাণের কাজ দেখার সুযোগ হয়। চারিদিকে শুধু শুষ্ক বালুময় জমি। সেই ধু ধু জায়গার এক কোণে কিছু মানুষ, একটি জায়গা থেকে মাটি কেটে ঝুড়িতে ভরে কিছুটা দূরে জমা করছিলেন। আমাকে জানান, এটি একটি 'পুকুর সংস্কার' প্রকল্পের কাজ, যদিও দেখে শুধু একটি সমতল মাঠ বলে মনে হচ্ছিল।

ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে খরা ত্রাণ প্রকল্পের বিবরণে যে বাক্যটি প্রায়শই ব্যবহার করা হয়, তা মনে পড়ল—''ডিগিং হোলস অ্যান্ড ফিলিং দেম আপ" (অর্থাৎ গর্ত খোঁড়া আর ভরাট করা)। প্রশ্ন জাগে—তবে কি তারা ঠিকই বলছে? খরা ত্রাণ প্রকল্প গ্রামীণ মানুষদের জন্য সংকটকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায় হয়ে ওঠে। কিন্তু শহরে বসবাসকারী কলমচিরা প্রায়ই এই প্রকল্পগুলোর সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, এত পরিশ্রম সত্ত্বেও এর মধ্য দিয়ে কোনো স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয় না। সরকার শুধু অর্থ অপচয় করছে।

পরের বছর (২০০৩ সালে), আবারও সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। আবার সেই গ্রামে গেলাম, এবার কিন্তু বর্ষার পরে। যেখানে আগে ছিল এক ধূসর মরুভূমির মাঠ, সেখানে এখন এক বিশাল হ্রদ—একপাশে কিছু মানুষ জল তুলছে, দূর প্রান্তে ছাগলগুলো জল খাচ্ছে, কোথাও কেউ কাপড় কাচছে! তখন বুঝলাম, আগের বছর যেটাকে আমি 'মাঠ' ভেবেছিলাম, সেখানে আসলে মাটির ঢাল আর গভীরতা আমার শহুরে চোখে ধরা পড়েনি, তাই সেটাকে পুকুর বলে চিনতে পারিনি।

এই অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিল—নিজে গিয়ে দেখা যথেষ্ট নয়। চোখে যা দেখা যায়, তাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা আরও বেশি জরুরি।

২০০২ সাল থেকে, প্রায় আড়াই দশক আগে, সংরক্ষিত শহুরে জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে সমীক্ষার জন্য গ্রামীণ এলাকায় যাওয়া শুরু করি। আমাদের পরিবারে এবং সামাজিক পরিসরে সামাজিক সুরক্ষা নীতিগুলি নিয়ে খুব কমই আলোচনা হত, আর যখনই হত, তখন সেটিও কেবল খবরের কাগজে পড়া তথ্যের ভিত্তিতে।

গবেষণার সময় যে জগৎ দেখেছিলাম, যার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করেছিলাম এবং যাকে নিয়ে গ্রামবাসী, সরকারি কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, ঠিকাদার প্রভৃতি বিভিন্নরকম মানুষের সঙ্গে কথা বলে এক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিলাম—সেই জগৎ খবরের কাগজ এবং আংশিকভাবে অর্থনীতির পাঠ্যবই থেকে আলাদা ছিল। সে জগৎ সংবাদপত্রের পাতায় বা টেলিভিশন চ্যানেলের পর্দায় গরহাজির। ধীরে ধীরে বোঝা গেল, শহর অবধি যদি সেই বাস্তবতা পৌঁছোয়ও, তাহলে তার হাজারো রূপের মধ্যে মাত্র একটা বা দুটোকেই সামনে আনা হয়।

এই বইটি আমাদের দেশের সামাজিক নীতির উপর লেখা। সামাজিক নীতি বিষয়টি আমাদের দেশে যারপরনাই অবহেলিত। উচ্চশিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স। সেখানে সামাজিক নীতিমালার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, প্রায় পঞ্চাশ জন অধ্যাপক রয়েছেন। কিন্তু যতদূর জানি, আমাদের দেশের কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত সামাজিক নীতির কোনো স্বতন্ত্র বিভাগ নেই। এই ক্ষেত্রের প্রতি অবহেলার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এটি একটি।[১]

গোড়াতেই পাঠকদের সঙ্গে এই কাঠামোটার পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চাই, যাতে তাঁরা একে চিনতে পারেন এবং সামাজিক নীতির পেছনে কী যুক্তি রয়েছে তা বুঝতে পারেন। কী কী নৈতিক এবং আর্থিক নীতিগত ভিত্তি রয়েছে যার ফলে শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বরং সারা বিশ্বের সরকার এই বিষয়ে খুবই যুক্ত থাকে? ভারতে কী ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন রয়েছে, তাও বোঝা জরুরি। পাশাপাশি এটা জানা দরকার, এই নীতিমালাগুলির বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে, বাস্তবায়নে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে এবং বাস্তবায়নে কী ধরনের ত্রুটি রয়েছে।